**সায়নীর স্বপ্ন**

**১৫**

দেখতে দেখতে সময় চলে যায়। বদলে যায় ঋতু। পূর্বের সূর্য রঙিন আভায় পশ্চিমে অস্ত যায়। পাখিরা নীড়ে ফিরে যায় দিবসের ক্লান্তি শেষে। এই ভাবেই যেন বদলে যায় সবকিছু।

সায়নীর জীবনেও যেন নেমে এসেছে ভোরের নরম রোদের সোনালি আভা। শরীরে, মনে, প্রানে, চিন্তা-চেতনায়, চোখের পাতায়, হাঁটা-চলায়, কথা-বার্তায়, পোশাকে-আশাকে, অঙ্গ-ভঙ্গিতে, চোখের ইশারায়-চাহনিতে সব কিছুতেই যেন কিশোরী মনের দোলন চাঁপার গন্ধ, ভালোলাগার প্রজাপতীর ছোঁয়া, মৌসুমী হাওয়ার উৎপল আনন্দ। এখন প্রায় সময়ই গুন গুন করে গান করে, নিজের মনে চুল আঁচড়ায়, ড্রেসিং টেবিলের সামনের স্বচ্ছ বিদেশী আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, ঘুরে-ফিরে চোখ বাঁকিয়ে নিখুঁতভাবে নিজকে দেখে, চোখে কাজলের রেখা টানে, মিট মিট করে নিজকে নতুন করে আবিস্কার করার চেষ্টা করে, ফিতা দিয়ে বেনি বাঁধে, গায়ে পারফিউম মাখে, ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক দিয়ে সন্ধ্যায় ছাদে গিয়ে নীল আকাশে তাকিয়ে কিছু খোঁজার চেষ্টা করে। বাতাসে উড়না ছড়িয়ে দেয়। ফুর ফুরা মনে পায়চারি করে ছাদের এপাশ থেকে অন্য পাশে আনমনে।

সায়নীর এই ব্যাপারটা দাদীমারও চোখে পড়েছে। ইদানীং দাদীমার ঘরেও বেশী যায় না সায়নী। অযথা গল্পে সময় কাটায় না। বেশির ভাগ সময়ই নিজের ঘরে থাকে। পড়াশুনা বেশ মনোযোগ দিয়েছে, অবসরে সুইটিকে বেশ সময় দেয়, কথা বলে, গান করে, সুইটিকে আদর করে দেয়, হাতের আঙ্গুলে সুইটির পালকে আলতো করে দুলিয়ে দেয়। মর্জিনার সাথে খালুদের বাসায়ও কম যায়। মাসে ২/৩দিন। আগের মতো আর প্রতি সপ্তাহে যায় না।

একদিন দাদিমা সায়নীকে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে-কিরে দিদি ভাই, তোর কি হয়েছে আজ কাল?

**সায়নী** (কিছুক্ষন পর, অন্য দিকে তাকিয়ে)-কেন দাদীমা? আমার তো কিছুই হয় নি?

**দাদিমাঃ** আজকাল তো আর গল্প শুনতে আসিস না? আমার সাথে বেশী কথাও বলিস না। কেউ বুঝি আছে তোর সাথে কথা বলার জন্যে, রঙ মিশিয়ে গল্প বলার জন্য? কাউকে মনে ধরেছে বুঝি?

সায়নী দাদীমার কথা শুনে অবাক হয়ে যায়। লজ্জায় মুখটা রক্তিম হয়ে উঠে। চোখে-মুখে হালকা বাসন্তী রাতের নরম চাঁদের আলোর ঝলকানি দোলে উঠে।

**সায়নীঃ** ছিঃ দাদীমা কি বলছ তুমি। পরীক্ষার জন্য খুব ব্যাস্ত ছিলাম।

**দাদীমা**: কাউকে মনে ধরেছে বুঝি? তোমাদের ব্যাপার-স্যাপার বুঝি না দিদি ভাই।

তারপর বেশ কিছুক্ষন চলে দাদী-নাতনীর আলাপচারিতা-খোশ গল্প, হাসি-তামাশা।

স্কুল বছর শেষের দিকে চলে এসেছে। সায়নীর মনে নেমে এসেছে ভোরের কুয়াশায় ভেজা দূর্বা ঘাসের উপড় দিয়ে বয়ে যাওয়া নরম হাল্কা বাতাসের দোলা। মনের আকাশে ধব ধবে সাদা বলাকারা পেখম মেলে আকাশের বুকে উড়ে বেড়ায় পত পত করে মনের আনন্দে। বন্ধুত্বের অনুভূতিতে আবদ্ধ সারা শরীর-মনে-চোখে উড়ে প্রথম সকালের রোদের সোনালি ঝলকানি। সায়নী যেন ধীরে ধীরে অনিন্দ্য সুন্দর প্রাণবন্ত স্কুল সম্প্রদায়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠে।

বার্ষিক পরীক্ষাও শেষ। এইতো গত মাসেই ম্যাথস অলিম্পিয়াড হয়ে গেলো। খুব ভালো হয়েছে সায়নীর পরীক্ষা। এখন অফুরন্ত সময়। ক্লাশ নেই, স্কুল নেই। অন্ততঃ আগামী তিন সপ্তাহ ছুটি। নতুন বছরের শুরুতে আবার নতুন ক্লাশ শুরু হবে। অবসরের বাঁধাহীন সময় আকাশের অস্তরাগের অমলিন সৌন্দর্যে সায়নীর মনে উড়ে বেড়ায় কিশোরী ভাবনারা, স্বপ্নের সামিয়ানায় বাসন্তী বাতাসেরা লুটিয়ে পড়ে।

স্কুল ছুটির আগেই ক্লাশে ঘোষনা করা হয়েছে নতুন বছরের কর্ম সূচী।

বছরের সমাপ্তি হিসাবে স্কুল একটি জমকালো অনুষ্ঠান আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বছরের শেষ সপ্তাহে। সেইদিন পরীক্ষার ফল ঘোষনা করা হবে। অলিম্পিয়াড আর “এ সেলিব্রেশন অফ ডিফারেন্স” এর ফলাফল ও জানানো হবে। তা ছাড়া বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হবে বরাবরের মতো। একই সপ্তাহে বছরের সবচেয়ে চমকপ্রদ সংগীত প্রতিযোগীতাও থাকছে।

এবারই সায়নী প্রথমবারের মতো পরীক্ষা দিয়েছে হাত খুলে, মন খুলে, ধীর চিত্তে অতিরিক্ত কোন সময় না নিয়েই। অটিস্টিকের কারনে সায়নী সবসময় এক্সট্রা সময় পেতো। তারপরেও সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারত না। কখনোই স্কুলে ভালো করতে পারেনি। প্রাইমারী স্কুলে থাকাকালীন সায়নীর বেশী সমস্যা হতো। অটিস্টিকের মাত্রাটা বেশী ছিলো। কোন কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারতো না বেশী সময় ধরে। কারো দিকে চেয়ে কথা বলতে পারতো না। একটু এদিক সেদিক হলেই মাথা বিগড়ে যেত। রাগে হাতের কাছে যা পেতো এদিক সেদিক ছুড়ে মারত। হি-হি-হি…হি হি হি করে হাত পা ছুড়া ছুড়ি করতো। স্কুলে অনেক সমস্যা হতো। অন্যান্য শিশুরা সায়নীর কাছ থেকে দূরে থাকতো। সায়নীর চোখ ঘুরানোকে ভয় পেতো। তর্জনী ঘুড়ানো দেখলেই ক্লাশের বাকি শিশুরা ভয়ে এক জায়গায় গিয়ে জড়ো হতো।

আজ অবসর মুহূর্তে দাদীমার কথাগুলো মনে পড়ে যায় সায়নীর।

পুরাতন ঢাকায় যখন একটা নামী-দামী বিদেশী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ত তখন সায়নীর জন্য স্পেশাল নীডস এর একজন বিদেশী সাদা মেম ছিল। নাম ছিল এলিজাবেথ স্মিথ। স্কুলে মিসেস স্মিথ নামেই সবাই ডাকতো। প্রথম প্রথম এই সাদা মেমকে দেখে সায়নী স্কুলে থাকতে চেতো না। খুব চীৎকার আর কান্না কাটি শুরু করে। দাদীমার গলা পেঁচিয়ে ধরে রাখতো। দাদীমার গালে গাল চেপে শক্ত করে দাদীমাকে ধরে রাখতো। প্রথম দিন যখন স্কুলে দাদীমা সায়নীকে নিয়ে যায় সেদিন খুব কষ্ট হয়েছিলো দাদীমার সায়নীকে স্কুলে রেখে আসতে। কোন ভাবেই সায়নী থাকতে চাচ্ছিল না। অনেক ভাবে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাতে হয়েছিলো। সেই দিনের গল্পই একদিন দাদীমা সায়নীকে শুনিয়েছিল।

শিক্ষক (মিসেস স্মিথ): হ্যালো! মাই ডিয়ার। ইউ আর সো কিউট। কাম কাম।

অন্য রকম ভাষা শুনে সায়নী জোড়ে চীৎকার দিয়ে উঠলো। দাদীমা সায়নীকে আদর করে বুঝাতে শুরু করলো-এই রকম করে না, দিদি ভাই। এই দেখ এখানে কতো তোমার মতো বেবী। সবাই খেলছে। উনি তোমার টিচার। যাও এখন।

-না যাবো না বলে সায়নী দাদীমার দুপা জড়িয়ে ধরে। মুখটা দুপায়ের মধ্যে ঠাসিয়ে রাখে। টিচার তখন সায়নীকে দুহাত দিয়ে সরানোর চেষ্টা করতো।

টিচারঃ কাম মাই চাইল্ড।

দাদীমা একটু রেগে বলে উঠে-ইংলিশ নো, বাংলা। সায়নী-নো ইংলিশ।-তারপর ডান হাত দিয়ে আকার ইঙ্গিতে টিচারকে বাংলায় কথা বলতে বলে। এবার টিচার বুঝতে পারলো যে ইংরেজী কথা না বুঝতে পেরে সায়নী আরো চীৎকার করছে। এবার গলাটা একটু নরম করে কিছুটা নাচার ভঙ্গিতে টিচার সায়নীকে টানতে টানতে বলতে থাকে-এবার এসো সায়নী। আমি তোমার সাথে খেলবো।-এই বলেই হাত দুটো মাথার উপরে নিয়ে আঙ্গুলগুলি কায়দা করে নাড়াতে থাকে আর জিহ্ব্বাটা বেড় করে হুতোম পেঁচার অভিনয় করতে থাকে। সায়নী এবার দাদীর শাড়ীতে ঢাকা মুখের একটা অংশ বেশ বুদ্ধির সাথে এক চোখে মিট মিটিয়ে টিচারের দিকে ফেলে। এমনিতেই বিদেশী স্কার্ট পড়া মেম। পায়ের অর্ধেকটা খালি। ঠোট দুটো লিপেস্টিক মেখে একেবারে টক টকে জবা ফুলের রং, এর মধ্যে বড়ো বড়ো চোখের অদ্ভুত মুখাবয়ব দেখে সায়নী হা-হা-হা করে হেসে উঠে। সাথে সাথে টিচার সায়নীর দিকে হাত বাড়ায়।

সায়নী (এক ঝটকায় হাতটা ছড়িয়ে মুখটা অন্য দিকে ঘুড়িয়ে নেয়)-না আমি যাবো না। আমি স্কুলে যেতে চাই না। আমি দাদীর সাথে থাকতে চাই।

শিক্ষক: এই দেখ। তোমার সব বন্ধুরা এখানে কি সুন্দর খেলছে। এস তুমিও খেলবে। তোমাকে যে স্কুলে থাকতে হবে। তোমাকে পড়তে হবে, খেলতে হবে, শিখতে হবে, নতুন বন্ধু তৈরি করতে হবে। তোমার দাদিমা আবার পরে এসে তোমাকে নিয়ে যাবে। এসো এবার। তুমি খুব ভাল।

সায়নী- তুমি পচা, আমি দাদীর সাথে থাকতে চাই। দাদী, আমি যাবনা। আমি তোমার সাথে থাকব।

শিক্ষক: ঠিক আছে। তুমি তোমার দাদীমার সাথে থাকবেতো? তোমার দাদিমাও এখানে থাকবে। আমিও তোমার সাথে থাকব।

আমরা একসাথে অনেক মজা করব। তবে তুমি তোমার বন্ধুদের সাথে থাকবে এবং খেলবে। তোমার দাদীমা আরেকটা রুমে থাকবে। তুমি তোমার দাদীমাকে দেখতে পাবে।

এই বলেই টিচার সায়নীর দাদীমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে ইশারা দেয়। সায়নীর দাদীমা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মনে মনে খুশী হন।

সায়নী- না আমি যাবো না। আমি ভয় পাচ্ছি।

শিক্ষক-তোমার দাদীমাতো থাকবে। ঐদিকে দেখ। ওরাতো আমাকে ভয় পায় না। আমিতো তোমার বন্ধু। আমরা এক সাথে অনেক খেলব। আমাদের কাছে অনেক খেলনা আছে। দেখ ওরা কি সুন্দর সুন্দর বই নিয়ে আঁকছে। কতো মজাদার গেম আছে আমার কাছে। চল তুমি দেখবে।

সায়নী (এবার মনে হল একটু নরম হল, মুখটা তুলে টিচারের দিকে এক নজর তাকাল। অন্য দিকে চেয়ে চেয়ে বলল) দাদীমা থাকতে পারবে?

শিক্ষক: হ্যাঁ, তোমার দাদীমা থাকবে তোমার সাথে। তোমার জন্য অপেক্ষা করবেন ঐখানে। যখন স্কুল শেষ হবে তোমাকে নিয়ে যাবে

সায়নী- মাথা নেড়ে এবার সায় দিল।

টিচার এবার সায়নীকে নিয়ে ভিতরে যায়। অন্য শিশুদের সাথে বসায়।

ধীরে ধীরে মেম সাহেবা সায়নীর সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। দাদীমা সায়নীর সাথে স্কুলে থাকে। স্কুল শেষ হলে আবার এক সাথে বাড়ী ফিরে যায়।

একদিন শিক্ষক মেম সাহেবা সায়নীকে বলে: "সায়নী, তুমি কি বুঝতে পারছো আমি কি বলছি?"

সায়নী: "মাথা নেড়ে বলে না”।

শিক্ষক: "তাহলে তুমি কোন প্রশ্ন কর না কেন সায়নী।"

হঠাৎ সায়নী চীৎকার করে উঠে। মাথা ঘুরাতে থাকে এপাশ-ওপাশ। ডান হাতের তর্জনী চোখের সামনে এনে অনবরত ঘুরাতে থাকে। চোখ দুটি বড়ো বড়ো করে টিচারের দিকে ভয়ানক ভাবে তাকিয়ে থাকে। এতোটুকু ছোট শিশুর এমন অবস্থা দেখে টিচার মেম একটু ঘাবড়ে যায়। জোড়ে মুখ ফসকে বেড়িয়ে আসে-সায়নী। এই রকম করছো কেন? সায়নীর এই অবস্থা দেখে বাকি শিশুরা ভয়ে সায়নীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

টিচারের জোড়ে আওয়াজ শুনে দাদীমা পাশের রুম থেকে হুর মূর করে ছুটে আসে।

দাদীমা (শিক্ষকের কাছে ছুটে আসে)-“ম্যাডাম, সায়নী অটিজমের জন্য অন্য শিশুদের মতো স্বাভাবিক আচরন করতে পারে না। একটু জোড়ে কথা বললেই সায়নী এই রকম করে”-এই বলেই সায়নীকে জড়িয়ে ধরে।–“ভয় পেয়ো না, দিদি ভাই”।

শিক্ষক: "আমি জানি, তুমি ভেবো না। আমি দেখছি, তুমি এখন আসতে পারো"

দাদীমা কথা না বাড়িয়ে রুম থেকে বেড়িয়ে যায়।

এই কথাগুলি মনে হওয়ায় সায়নী জোড়ে জোড়ে হাসতে থাকে। ওর রুমেই ছিল সায়নী তখন। ওর একাকী হাসতে দেখে সুইটিও আনন্দে ডানা ছড়িয়ে লাফাতে লাগলো।

সায়নী এখন অনেক ভাল। অটিজম আছে বলে স্বাভাবিকভাবে চোখে ধরা পড়ে না হঠাৎ করে। সুস্থ স্বাভাবিক মেয়েদের মতোই এখন প্রায় সময় আচরন করে। আগে গুন গুন করে গান করতো। কিন্তু ইদানীং এই গুনগুনানী বৃদ্ধি পেয়েছে। নিজের বেডরুম কিংবা বাথ রুমের গন্ডি পেড়িয়ে সিটিং রুমেও ঠাঁই গেড়েছে। কখনো কখনো কোন এক সোনালী সন্ধ্যায় বাড়ির ছাদে পায়চারী করতে করতে খোলা চূল বাতাসে উড়িয়ে ভরাট গলায় গান গাইতে শুরু করে। ডান হাতে তালের ছন্দে কখনো বা নেচে উঠে।

একদিন হঠাৎ সায়নীর মার চোখে পড়ে সায়নীর পায়চারী করে গান গাইতে।

ঠিক তার দুদিন পরেই বাড়ীতে নতুন হারমোনিয়াম আসে। এখন সায়নী শিক্ষকের কাছে গান শিখে। কয়েকটি ক্লাশ নেওয়ার পর পরই একদিন গানের শিক্ষক সায়নীর মাকে ডেকে পাঠান।

সঙ্গীত শিক্ষকঃ ম্যাডাম, আমি সায়নীর মিউজিক ক্লাসে অগ্রগতি সম্পর্কে আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই। বসুন।

সায়নীর মা (পাশের চেয়ারে বসতে বসতে): শুভ বিকাল, মিস নাজমা। কেমন আছেন?

সঙ্গীত শিক্ষকঃ ভালো ম্যাডাম। আপনি কেমন আছেন?

সায়নীর মা (স্মিত হেসে): ভালো আছি। সায়নী কি পারছে না? আপনাকে তো বলেছি ওর একটা প্রবলেম আছে। ইদানীং সব কিছুতেই ওকে স্বাভাবিক মনে হয়। তবে ওর সাথে রাগ করলেই ও একটু অন্য রকম হয়ে যায়। তাছাড়া…

সায়নীর মা কথাটা শেষ করতে পারেনি। থামিয়ে দিয়ে সঙ্গীত শিক্ষক বলতে থাকে-“ না, না এসব কিছু না। ও একদম ভালো। শুধু ভালোই না। সায়নীর কন্ঠ খুব মিষ্টি। সংগীতে সায়নী খুব ভলো করবে। তার নিজস্ব একটা সুন্দর আবেগ আছে যা অত্যন্ত ন্যাচারাল। ওকে যদি একটু আলাদাভাবে নজর দেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও একদিন আপনাদের মুখ উজ্জ্বল করবে।

সায়নীর মা: ওহ, তাই? এটা শুনতে সত্যিই চমৎকার! খুব ভালো লাগলো। ছোটবেলা থেকেই সায়নী গুন গুন করে গান করতো। আমি আগে অবশ্যই কখনো বুঝতে পারিনি। সায়নীর দাদীমা আমাকে প্রায় সময়ই বলত যে সায়নীর জন্য গানের শিক্ষক রেখে দিতে। তেমন গুরুত্ব দিতাম না। কিন্তু কয়েক দিন আগে ছাদে সায়নীর গান শুনে আমি অবাক হয়ে যাই।

সঙ্গীত শিক্ষক: হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। এই ধরনের অটিস্টিক শিশুদের অনেক ধরনের প্রতিভা থাকে। সংগীত তার মধ্যে একটি। সুর এবং ছন্দের প্রতি তার প্রখর কান রয়েছে। একবার শুনেই সুর তুলতে পারে। সহজেই নতুন কৌশল গ্রহণ করতে পারে। এই কয়দিনেই আমি বুঝতে পেরেছি তার সংগীতে সফল হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে। একটু মনোযোগ দিলেই হবে।

সায়নীর মা: এটা সত্যিই চমত্কার খবর! সায়নীর দাদীমা শুনলেতো খুব খুশী হবে। সায়নীর বাবাকেও আমি কথাটা জানাবো। আমাদের কি কি করা উচিত, একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?

সঙ্গীত শিক্ষক: অবশ্যই। আমি মনে করি যদি সায়নী ঠিক মতো প্রতিনিয়ত নিজেকে অনুশীলন এবং চর্চার মধ্যে রাখে তাহলে সে সত্যিই খুব ভালোভাবেই সব কিছু আয়ত্বে আনতে পারবে। তাকে নিয়মিত একটা সময়ে প্র্যাকটিস করতে উৎসাহিত করবেন। আপনারা যেটা করবেন সেটা হলো উৎসাহিত করা। সাথে সাথে তার আবেগকে লালন করা, তাকে অন্যান্য সঙ্গীতশিল্পীদের সাথে পারফর্ম করার এবং সহযোগিতা করার সুযোগ প্রদান করা যা তাকে আরো পারদর্শী করে তুলবে।

সায়নীর মা: এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চন্ত থাকুন। আমরা সবাই তাকে উৎসাহিত করবো এ কাজে। সায়নীর এ কথা শুনলে আমার শাশুড়িই ওকে সবচেয়ে বেশী উৎসাহিত করবে। আপনার কথায় খুব ভালো বোধ করছি। অশেষ ধন্যবাদ মিস নাজমা। আপনিও যদি পারেন একটু প্রেরনা দিবেন।

সঙ্গীত শিক্ষক: অবশ্যই, ম্যাডাম। এটাতো আমার কর্তব্যে। এমন একজন মেধাবী শিক্ষার্থীকে পেয়ে আমি সত্যিই আনন্দিত। তার যে উত্সাহ এবং সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি, আমার কোন সন্দেহ নেই যে সায়নী একদিন সংগীত যাত্রায় উন্নতি করবে। তার বিশেষ প্রতিভা রয়েছে সংগীতে। এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই।

সায়নীর মা: আবারো ধন্যবাদ। আমি আপনার এই কথাগুলিকে মনে রেখে সায়নীকে উৎসাহিত করবো। সেই থেকে নিয়মিত চলছে সায়নীর সংগীতে বিশেষ মনোযোগ।

কয়দিন আগেই সায়নী তের বছরে পা দিয়েছে।

এই প্রথম বারের মতো সায়নীর জন্ম দিনটা ধুম ধামের সাথে পালন করা হয়েছে। আগে কখনো এমনটি হয় নি। খুব সাদা মাটা ভাবেই আগে জন্ম দিনগুলো হতো। দাদীমাই সব ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু এই প্রথমবারের মত সায়নীর মা সায়নীর এ বিশেষ দিনটিকে বিশেষভাবে আয়োজনের ব্যবস্থা করেন। ছাদের উপড় সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে বেশ ঝাক জমক করেই সায়নীর জন্ম দিনটা পালন করা হয়। অনেক আত্মীয়-স্বজন আসেন। বিশাল বড়ো একটা কেক আনা হয়েছিল। তেরটা রঙিন কেন্ডেলে কেকটা সাঁজানো হয়েছিল। বেশ মজা করেছিল সায়নী সেই দিন।

সব কিছুই কেমন বদলে যাচ্ছে সায়নীর। একাকীত্বের জীবন থেকে ধীরে ধীরে রাতের অন্ধকারের বুক চিরে পূর্বের সূর্য রশ্মির নরম সোনালী রোদের ঝলকানীর মতোই ভালোলাগা আর ভালোবাসার গন্ডোলায় হাঁটতে শুরু করলো। নিজের মধ্যে বাড়তে শুরু করলো নতুন আত্মবিশ্বাস এবং আত্ম-সচেতনতা। অটিজমের কারনে জীবন চলেছিল নানা চ্যালেঞ্জ এবং বিজয়ের মধ্য দিয়ে। কখনো বা বিষাদের ঝড় আছড়িয়ে পড়তো সাগড়ের বিস্ফোরিত উছলিয়ে পড়া জলরাশির মতো সায়নীর অবয়বে, একাকীত্ব আর অবহেলার পাথর চাপা দিয়ে রাখতো মরুর ধুলিকনাময় হাহাকার হৃদয়টাকে। ভালবাসাহীন ভাবে দুদন্ড শান্তির আশ্রয় খুঁজেছিল সুইটির সাথে কথোকপথনে আর দাদীমার ঠাঁকুরমার ঝুলিতে। তার পর হঠাৎ করেই বদলে গেল সব কিছু।

সায়নী একদিন আবিস্কার করলো তার অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভালোলাগার হৃদয়টাকে। নতুন এক প্রতিভাকে আলিঙ্গন করতে শিখেছে, বুঝতে পেরেছে যে তার জীবনের বিশেষ পার্থক্যগুলি কোন সীমাবদ্ধতা নয় বরং শক্তির উত্স। তার জীবন তাকে তার পরিচয়কে নিয়ে বাঁচতে শিখিয়েছে।

স্কুলের অন্যদের সাথে তার সম্পর্ক উল্লেখযোগ্যভাবে বিকশিত হয়েছে। যদিও প্রাথমিকভাবে নানা ধরনের বিচ্ছিন্ন বা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে সায়নীকে নিয়ে, কিন্তু এখন সকলেই সায়নীর আত্মার আত্মা, হৃদয়ের হৃদয় খুব ভালোলাগার সহপাঠি। চারিপাশের সব কিছুতেই সায়নীর ভালোলাগার চমক ফুটে উঠে চোখে মুখে। তার চারপাশের লোকদের উপর তার প্রভাবের ঝলক দেখতে পাওয়া যায় এখন। শান্তনু সায়নী এই পরিবর্তনের আরেকটি কারন। ভালোবেসে অতি আগ্রহে কেউ কখনো আগে সায়নীর সাথে কথা বলেনি, উৎসাহ দেয়নি, সায়নীর সমস্যায় শক্তি ও সাহস দেয়নি। শান্তনুই যেন প্রথম সায়নীকে এক নতুন গোধূলীর গল্প শোনালো, খুব ভালোলাগার, ভালোবাসার এবং উচ্ছ্বাসে স্বপ্ন দেখার।

এই সব নিয়ে ভাবতে ভাবতে কখন যে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো সায়নী টেরও পায়নি। কিছুক্ষন পরেই গানের শিক্ষক আসবেন। এবার স্কুলে বার্ষিক সংগীত প্রতিযোগীতায় সায়নী নাম দিয়েছে। গানের প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহন করবে। আজকে সেই গানের প্র্যাকটিস হবে। আর কয়দিন পরেই স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠান।

তাড়াতাড়ি হুরমূর করে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো সায়নী।

বাহির থেকে তখন মুয়াজ্জিনের আযানের শব্দ ভেসে আসছিলো। দাদীমার কন্ঠও হালকাভাবে ভেসে এলো-“মর্জিনা, কোথায় গেলিরে….।“

**চলবে---)**

**ড. পল্টু দত্ত**

**শিক্ষক, গবেষক এবং কলামিষ্ট**